স্মৃতি সত্তায় ভবিষ্যৎ

বিশ্বজিৎ রায়

পুনশ্চ

১এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

কথামুখ

এই গদ্যগ্রন্থটিতে অনূর্ধ্ব তিরিশ এক যুবকের জীবন যাপনের ছবি আছে। সে স্বাধীনতা আন্দোলন দেখে নি, কমিটেড কমিউনিস্টদের কথা শুনেছে, নকশাল আন্দোলনের কথা বইতে পড়েছে। তবে দেখেছেও বিস্তর। মুক্ত অর্থনীতির বিস্তার, বাংলামাধ্যম স্কুলের গঙ্গাযাত্রা, উন্নততর বামজমানার পত্তন তার চোখে দেখা। এই সব না-দেখা, শোনা, পড়া এবং দেখা নিয়েই এই বই। ত্রিধাবিভক্ত বইখানির সে একটা নামও দিয়েছে। সে বুঝেছে মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালি তাদের স্মৃতি ও সত্তাকে ভবিষ্যতের মনগড়া আয়না দিয়ে দেখে। ভবিষ্যতের বাঙালি কেমনভাবে থাকবে বা থাকবে না তার সূত্রেই তারা স্মৃতি ও সত্তাকে যাচাই করে নেয়। এ জন্য বইখানির নাম স্মৃতি সত্তায় ভবিষ্যৎ। হ্যাঁ, কবি বিষ্ণু দে ও তাঁর কাব্যগ্রন্থ এখানে নামান্তরিত।

এই বই-এর লেখাগুলির একটি বাদ দিয়ে সব কটিই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল, ২০০৩ থেকে ২০০৫ এই কালপর্বে। 'সুটকেস' লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকার ১৪১০ সালের শারদীয়া সংখ্যায়। এ জন্য সংশ্লিষ্ট সম্পাদকদের কাছে সে কৃতজ্ঞ।

লেখাগুলি গড়ে ওঠার সময় সে নিজে বিচলিত হয়েছে। প্রকাশিত হওয়ার পর বিচলিত হয়েছেন ঢের বেশি মানুষ। সংবাদপত্রে চিঠি দিয়ে প্রতিবাদও করেছেন অনেকে। অন্য সংবাদপত্রের মান্য লেখকেরাও কেউ কেউ নাম না করে তাকে বকুনি দিয়েছেন। এসবই তার প্রাপ্য। পরিবর্তে ধন্যবাদ ছাড়া আর কিছুই তার দেওয়ার নেই। আর এই সব লেখার অনেকগুলিরই প্রথম পাঠিকা যে, সে ধন্যবাদের অপেক্ষাও করে না। তবে পুনশ্চের অধিকর্তা কাগুজে লেখাগুলিকে খানিকটা রূপান্তরিত চেহারায় বই হিসেবে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বলে সে বেজায় খুশি।

বিশ্বজিৎ রায়

সূচিপত্র

১. স্মৃতি ৯-৪০

অন্য শীতের স্মৃতি ১১

নিউ মার্কেটের বৃত্তান্ত ১৪

কালো রাজপুত্তুর, ভাল রাজপুত্তুর ১৮

বেণীর বসন্ত ২১

ধান দেব মেপে ২৪

সেই সব জলছবি ২৭

সেই পুজো ৩০

বই সুখ ৩৫

সুটকেস ৩৮

২. সত্তা ৪১-৬৪

মুখোপাধ্যায়রা ৪৩

মুজতবা ৪৭

রবীন্দ্রনাথই এন্ট্রিপয়েন্ট ৫১

দুখন্তি, শুকনো গাছে এবার পাতা জাগবে ৫৪

বড় মায়াময় ৫৭

শিশিরকুমার দাশ স্মরণে ৬১

৩. ভবিষ্যৎ ৬৫-৯৬

খাঁটি বাঙালির খোঁজে ৬৭

বই নিয়ে ৭৪

ইতিহাসের প্রহার ৭৯

সাইনবোর্ড বেত্তান্ত ৮২

পুনশ্চ সাইনবোর্ড বেত্তান্ত ৮৫

বাংলা মিডিয়াম কথা ৮৮

অতঃপর বাংলা মাধ্যম ৯১

বাংলায় ব্যাট বাংলায় বল ৯৪

অন্য শীতের স্মৃতি

কলকাতার মতোই কলকাতা-সংলগ্ন জনপদে শীতের স্বাদগন্ধ বদলে গেছে। তবু এখনও ঘন ছমছমে আলো-আঁধারে মুখের গল্পে ভর করে কাছে এসে থমকে দাঁড়ায় সেই সব হিমগন্ধী সাঁঝসকাল। ঘোমটা খুলে সেই বুড়ি শীতের বুকে মুখ ডোবালেই ফিরে আসে অন্য যৌবনের তাপ।

ইলেকট্রিক ট্রেন ছিল না। ঝিকঝিকে রেলে কলকাতা যেতে-আসতে অনেক সময় লাগত। কাজের দিনে পথ ছুটত সাতসকালে, বাড়ি ফেরার সময় রাতপাখি ঝাপ্টা মারত বিগত সন্ধ্যার বুকে। রবিবার তাই বড়ো আমোদের দিন, শীতের চাতালে বসে রোদ মাখার দিন। চাতালে ডালের বড়ি শুকোচ্ছে, আর তপ্ত হচ্ছে কাঁসার গুপো বাটি-গ্লাস। বিষ্যুতবার নিরামিষ। ফালা-ফালা করে কাটা আলু আর নতুন ওঠা কপি দিয়ে বাড়ির সবার জন্য বড়ো করে যে ঝোল রাঁধা হবে তাতে বড়িও পড়বে। ঝোলভাতের স্নিগ্ধ গন্ধে লক্ষ্মীমন্ত হয়ে উঠবে ঘর-গেরস্থালি। একটু বাদে সারা সকালের রোদে যখন আগুন তপ্ত হয়ে উঠবে কাঁসার বাটি-গ্লাস, তখন শুকিয়ে যাবে কাচা মাড় দেওয়া ধুতি-শার্ট। কাচা কাপড় টানটান করে রাখা হবে বিছানায়। কাপড় জড়ানো আতপ্ত বাটি আর গ্লাস চালিয়ে ধুতি-শার্ট ইস্ত্রি করে প্রসন্ন মুখে উঠে দাঁড়াবেন গোপাল মজুমদার। ধুতি আর শার্টের গায়ে লেগে থাকবে ভাতের মাড়ের, কাঁসার বাসনের আর অপরিমেয় রোদের গন্ধ।

সে দিন গঙ্গার খালে মাছ ধরার দিন। সদু জেলে বাড়ি বয়ে বলে গেছে মা ঠাকুরনদের। শীতের ঢলে পড়া সকালে মটরদিভাই আঁচলের খুঁটে পয়সা বেঁধে পাড়ার বউ ঝিদের নিয়ে হাজির হবেন খালপাড়ে। খালের ওপর থেকে রুমালে পয়সা বেঁধে ফেলে দেবে নীচে। সদু জেলে সেই রুমালে বেঁধে ওপরে ছুড়ে দেবে মৌরালা, পুঁটি, গাংদারা মাছ।

সমস্ত রান্নার শেষে উনুনের আঁচ নিভে আসে। তখন কেটে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে বাটিতে সামান্য তেল জল দিয়ে সেই কাঁচা মাছ বসিয়ে দেওয়া হয়। ওপরে থাকে কুচো টমেটো আর দু'আধখানা করা কাঁচা লঙ্কা। ধিকিধিকি আঁচে তৈরি হয় টাটকা মাছের মাখো মাখো ব্যঞ্জন। সেই ম ম গন্ধে উনুনের পাশে

এসে জোটে মানু, কানু, মীরু। নাতনিদের দেখে মটরদিভাই বলেন, 'বউমা ওদের খেতে দাও।'

দুপুরের লেখাপড়া শেষ। বিকেলে খেলতে যাওয়ার ছুটি। বড়োদিনে ক্লাবের ফাংশান। জিমনাস্টিক আর ব্রতচারীর নাচে গানে মেতে ওঠে ওরা। শীতের বিকেল দ্রুত ফুরিয়ে আসে। ফুরনো বিকেলে সবাই মেমের নাচ নাচে। সুর করে মুখে ছড়া কাটে— 'বাঁশের কঞ্চি আঠারো ইঞ্চি/নাচে মেমের বোনঝি (গো) লম্ পম্-পম্ পম্।' ছড়ার সুরে ঘুরে যায় পুরো এক পাক। ফ্রক দুলে ওঠে।

ইংরেজরা নেই, দেশ স্বাধীন হয়েছে সদ্য। মেম আর মেমের বোনঝি ফিরে গেছে নিজভূমে। তবু শীতকালে কাঠের ঘরে আগুনের ধারে ঘুরে ঘুরে তারা যে নাচ নাচত সেই নাচের কথা মুখে-মুখে, ছড়ায়-ছড়ায়। বাঁশ ঝাড়ের পিছনে সূয্যি ডোবে। শাঁখ বেজে ওঠে।

এই শীতে পোষ লক্ষ্মীর পুজো। এলামাটি আর চালবাটার আলপনা সিঁড়িতে সিঁড়িতে থইথই করে। আলপনা শুকিয়ে গেলে এসে জমে কালো পিঁপড়ের দল। চালবাটার সোয়াদ নেয় তারা। ওরা থাক, ওরা এলে গেরস্তের ভালো হয়। পুজোর আগের রাতে কুয়াশা চাদরে খেলা করে প্রায় ভরন্ত চাঁদের আলো। কাল পূর্ণিমা। ঘুমোতে যাওয়ার আগে ছাদের ঠাকুর ঘরের সামনে সক্কলে জমায়েত হয়। পেতলের মাজা ঘটিতে জল ভরেন মটরদি ভাই। কাল সাত সকালে পেঁচায় চেপে ছাদে নামবেন লক্ষ্মীঠাকুর, ঘটির জলে পা ধোবেন, তারপর ঢুকে পড়বেন ওদের বাড়ি। কোনও কিছুর অভাব থাকবে না আর। ঘটিভরা জলের দিকে তাকিয়ে মীরু মনে মনে বলে, 'এসো লক্ষ্মী ঘরে/ধান দিও ভরে।' কাল সন্ধেবেলা পূর্ণিমা চাঁদের মায়াময় আভা মেখে লক্ষ্মীপেঁচা যেন ছাদে নামে। বাহন ছাদে নামলেই তো বোঝা যাবে বাড়িতে লক্ষ্মী এসেছেন। তাদের টাকা হবে, ডাক্তার বাড়ির আটচালায় নাচের ক্লাসে ভর্তি হবে সে।

শীতের লক্ষ্মীকে ধরে রাখতে হয়। অপচয় করতে নেই। খাতার শেষ পাতাতেও লিখতে হয়। লক্ষ্মীকে ঘরে রাখার জন্যই তো পোষ সংক্রান্তিতে বাউনি বাঁধা। সে বড়ো আমোদের খেলা। চাষি-বাড়ি থেকে খড় আনা হয়। দরজার শিকলে, জানালার গরাদে, কাঠের আলমারির হাতলে, জাল আলমারির ছিটকানিতে খড়ের গিঁট্টি দাও। এ বাঁধন খুলে যাক দেখি লক্ষ্মীঠাকুর কেমন যেতে পারে! খড়ের বাঁধনের সঙ্গে ওরা ছড়ার বাঁধন দেয়। ছড়াই তো ওদের

মন্তর। বুকে বিশ্বাস নিয়ে সমস্বরে বলে, 'আউনি বাউনি পিঠে পুলি খাও/তিন দিন ঘরে থাক কোথাও যাউনি।' একবার নয়, এ ছড়া বলতে হয় তিন বার। বললে টাকা আর হিসেব নিয়ে খিটিমিটি লাগবে না বাবা মার।

না, ধানের সঙ্গে চাষের সঙ্গে কোনও যোগ নেই মীরুদের, তবু তাদের যৌথ নিশ্চেতনায় সেই সব দিনের স্বাদ-গন্ধ-ছড়া রূপকথার আমেজ নিয়ে ধরা দেয়। ব্রতকথার অলি-গলিতে কল্পনা এক্কা দোক্কা খেলে।

কোনও কোনও রবিবারের সন্ধে বেলা রাধা-কৃষ্ণের মঠে যেতে হয়। মটরদিভাই আঁচলে চাবি ফেলে পাকা মাথায় সিঁদুর দিয়ে হাঁক দেন— 'মীরু'। মীরু ঠামার পিছু নেয়।

আজ মঠে রকমারি ব্যঞ্জনে রাধাকৃষ্ণের সেবা হবে। গঙ্গার ধারেই মঠ। মঠের গোয়ালে গোরু, গোলায় ধান— সম্পন্ন ভক্তদের নিয়মিত আনাগোনা। শীতের ধোঁয়াশায় কীর্তনের সুর লাগে। গঙ্গার বুকে কেঁপে কেঁপে ওঠে জেলেদের নৌকার আলো। পাকশালে রান্না চাপে। কীর্তনের কথায় সুরে মটরদির চোখে জল। মীরু দেখে কীর্তনের তালে তালে দুলে উঠছে গৌরদাস বাবাজির ধবধবে সাদা দাড়ি। গাঢ় শীতেও ঘেমে ওঠে নৃত্যরত কীর্তনিয়ার দল। পোষা কুকুর ঘুম থেকে উঠে গা ঝাড়ে। পায়েসে পাটালি পড়ে। নতুন গুড়ের গন্ধে ভরে ওঠে মঠের ঘর বারান্দা। বাজারের মিষ্টির দোকান থেকে সেবার জন্য পাঠানো হয় গরম রসগোল্লা। বড়ো তিজেলে গুবগুবিয়ে জল ফোটে। তিজেলের মুখে বাঁধা থাকে পাতলা ধুতি। ধুতির ওপর ভাপে ভাপে তৈরি হয় পিঠে।

কীর্তন শেষ। হরির লুঠের বাতাসা কুড়োয় সবাই হইহই করে। মঠের উঠোনে পাত পড়ে। হ্যাজাকের আলো জ্বলে। সাপটে খেতে গিয়ে সাদাটে সোনালি পায়েসের ছোপ লাগে বাবাজির শিষ্যদের কালো গোঁফে। রসকলী-কাটা কমবয়সি বৈষ্ণবীরা ঠাট্টা করে। সন্ধে ঢুকে পড়ে রাতের চাদরে। গঙ্গার জলে জেলে নৌকার আলো আর চোখেও পড়ে না। দু'চোখে ঘুম নামে।

সোমবারের ভোররাতে কুয়াশার গন্ধ মেখে কুয়ো পাড়ে দাঁত মাজেন গোপাল মজুমদার। মরা চাঁদের আলো মেখে শীতের রবিবার তখন ডুবে গেছে।

নিউমার্কেটের বৃত্তান্ত

বড়োদিন, শীতমাখার ছুটির দিন। অবশ্য অকস্মাৎ শীতকুয়াশার বুকে টুকটুকে রোদ মুখ তুললেই এখন ছুটি হয় না আর। কেয়াপাতার নৌকা গড়ে জলে ভাসানোকে এখন কেউ কি আর ছুটির খেলা বলে? ছুটি এখন ইভেন্ট এবং ক্রিসমাসও। ইভেন্ট মাস্টাররা দিকে দিকে ছিটিয়ে রেখেছেন ছুটি যাপনের ছবি: 'এ বার বিষ্যুতে ক্রিসমাস, সুতরাং যদি শুক্রবার ম্যানেজ করতে পারেন তবে শনি-রবি মিলিয়ে চার দিনের নিটোল উইকএন্ড।' সো গাইস, এনজয়। নতুন অর্থনীতিতে বাঙালি মনের, অন্তত টাকা আছে যাদের, অবদমন অপস্রিয়মাণ। মদ্য, মাংস, অগ্নিতাপ, বহুবিধ দেশি-বিদেশি খাদ্য, নারী-পুরুষের নৃত্য, এ-সব নিয়েই শীতসাহসিক নগরালি। ইট'স হট। বস্তুবিশ্বের এই নব্যতন্ত্র বড়ো মোহময় এবং ক্রমশ এর চাপে পুরনো আধারগুলি বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক যেমন উনুনের বদলে গ্যাস ওভেন, হাতে বোনা সোয়েটারের বদলে উইন্ডচিটার। সেই আগুন সেই উষ্ণতা, কিন্তু আধার আলাদা।

বুড়ো সান্টাক্লজ, ক্রিসমাস গাছ, রুপোলি রাংতার তারা, ক্র্যাকার এ-সব ছুঁয়ে ছুঁয়ে এই ক্রিসমাসে তাই একবার নিউমার্কেটের বুকে শরীর ডুবিয়ে দাঁড়াতে হল। এখনও ভিড় আছে, আলো উৎসব আছে, কলকাতার অবাঙালিদের আহ্লাদি চলাচল আছে। তবু কান পাতলে ঠিক টের পাওয়া যাচ্ছে তালকাটা সুর। সে-সুর এমন বেতালা নয় যে নিউমার্কেটের এপিটাফ লিখতে হবে, তবে এই বচ্ছর-শেষের শীতে একবার বুঝে নেওয়া চাই আনখশির নিউমার্কেটের শরীর— অন্তত সদ্যতন মাল্টিপ্লেক্স, অন্যান্য অধুনানির্মিত এবং নির্মীয়মাণ কয়েকতল কমপ্লেক্সের সঙ্গে বুড়ি নিউমার্কেটের শরীরী তুলনায় যদি বিষাদও জাগে তবু ভোক্তা নিরুপায়। বড়োদিন যিশুর দিন; যিশুর রাজ্যপাটে চেকনাইওয়ালা যুবা, তন্বী রমণী, হাভাতে বুড়ো, শনের নুড়ি বুড়ি সমান আদর পেলেও বাস্তবে পায় না, একদা জৌলুসময় বাজার নতুন বাজারের দাপটে মুখ লুকোয়।

বাজার হিসেবে নিউমার্কেটের নয় নয় করে বেশ বয়স হল। একদা কলোনির সাহেব-প্রভুরা হাট-বাজারের বদলে নগর কলকাতায় যে-সব মার্কেট তৈরি

করেছিল তাদের উজ্জ্বলতা এখন ক্রম-অস্তমিত। তবু কেমন করে কলকাতার পুরুষেরা ভুলে যাবে নিউমার্কেটের অমোঘ টানের কারণাকারণ? লাইটহাউস, গ্লোব, রিগ্যাল ঘেরা নিউমার্কেটে সেই সব সন্ধে-বিকেল ঘুরে ঘুরেই কেটে যেত। নিউমার্কেটের এক অঙ্গে কত রূপ। নিউমার্কেটের মূল প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকলে যে-গন্ধ, যে-স্বাদ টের পাওয়া যায় পিছন দিয়ে ঢুকলে তার ছিটেফোঁটাও মিলবে না। অথচ নতুন সব বহুতল শপিং কমপ্লেক্সের একটাই প্রবেশপথ, ইচ্ছে থাকলেও প্রবেশের স্বাদ বদলানোর উপায় নেই। সে-কালের শীতে ভারত সফরকারী বিদেশি ক্রিকেট খেলুড়ের দল গ্লোবের উলটো দিকের গেট দিয়ে ঢুকে সোজা চলে আসত সাজানো গোলঘরে। কামানের চারদিকে বর্ণময় আলো। ডান দিকে ইহুদি পরিবারের কেকের আয়তাকার দোকান, চমৎকার সুবাস। পরিযায়ী সাহেব-মেম উদ্ধত প্রত্যয়ে চলমান। বিত্তশালী রমণীরা বর্ণালী ছড়িয়ে যায়। এই আলোকিত ক্রেতাদের পাশে ছিল আর একটা নিউমার্কেট। সেই নিউমার্কেটের শরিক অতিরিক্ত রেস্তহীন মধ্যবিত্ত, কপর্দকহীন গাঁটকাটা ধান্দাবাজ। মধ্যবিত্ত পুরুষেরা নিউমার্কেটে উদ্ভিন্ন নারী সন্দর্শনে আসতেন। অরুণকুমার সরকার ও সমর সেনের কবিতায় ফিরিঙ্গিনি দর্শনের যে-বিবরণ আছে তার অনেকটাই এ-অঞ্চল সংলগ্ন। এই দর্শনের মধ্যে মিশে যেত পাপবোধ, লুব্ধতা, মধ্যবিত্তের অবদমিত ইচ্ছের নিরুপায়ত্ব। আসলে ল্যান্সডাউন কিংবা কলেজ স্ট্রিট মার্কেট অবস্থানগত কারণেই অবাঙালিয়ানার উত্তাপ গায়ে মাখতে পারেনি, নিউমার্কেট পেরেছিল। চলমান গণিকা, দারিদ্র, সাহেবিয়ানার এ এক আশ্চর্য ককটেল।

আর এই ককটেল উপভোগ করা যেত তারিয়ে তারিয়ে। নিউমার্কেটের পেটের মধ্যে অনেক গলি, অনেক বাঁক। সাদাটে ফ্লুরোসেন্ট আলোর উন্মোচক তঞ্চকতা ছিল না, বদলে ছিল ঝিমধরা হলদেটে আলো। ফলে নানা গলির বাঁকে হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ত নতুন নতুন আইটেম। অনেক বার নিউমার্কেটে এসেও চোখ এড়িয়ে যেত কোনও-না-কোনও দোকান। ফলে এ-যেন দ্রৌপদীর শাড়ি ফুরোতে চায় না, পুরনো হয় না। এসে নির্বিবাদে কিছু না কিনে চোখ দিয়ে চেখে চেখে চলে যাওয়া যায়। ক্রেতা কিংবা চাক্ষিক যে-দিক দিয়েই বাইরে আসুক না কেন, অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিউমার্কেটের নানা পাশে ইতস্তত দাঁড়ানো, বসা হকারদের বিপণি। নিউমার্কেটের সংলগ্ন এ-যেন আর একটা নিউমার্কেট। যাদের পয়সা নেই অথচ সাধ রয়েছে ষোলো আনা তারা এখান থেকে জিনিস